কম্পিউটারের ইতিহাস ও শ্রেণীবিভাগ

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তার চিন্তা ও চেতনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে আসছে। তার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। তার মধ্যে কম্পিউটার অন্যতম। কম্পিউটার মানুষের চিন্তা ও চেতনার অন্যতম ফসল এবং এটা মানুষের আগ্রহের বিষয়বস্তু বটে। কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানে একটি নতুন ক্ষেত্র সংযোজিত হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, যে জাতি কম্পিউটার ব্যবহারে যত বেশি আগ্রহী সে জাতি তত বেশি উন্নত। আমাদের দেশেও কম্পিউটার ব্যবহার এক জোয়ার সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ স্তর সর্বক্ষেত্রে কম্পিউটার শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য। বর্তমান ইউনিটে কম্পিউটারের সংজ্ঞা, ইতিহাসের ক্রমবিকাশ, কম্পিউটারের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন গণনা পদ্ধতি, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার, কম্পিউটারের বিবর্তণ, কম্পিউটার প্রজন্ম প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই ইউনিট শেষে আপনি-

- কম্পিউটারের সংজ্ঞা জানতে পারবেন,
- কম্পিউটারের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- প্রচিন গণনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- কম্পিউটারের বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবেন,
- প্রজন্ম হিসাবে কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

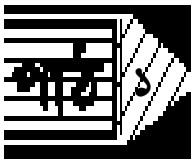

কম্পিউটারের সংজ্ঞা ও কাজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কম্পিউটারের সংজ্ঞা বলতে পারবেন,
- কম্পিউটারের কাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন।

কম্পিউটারের সংজ্ঞা

কম্পিউট (Compute) শব্দের অর্থ হচ্ছে গণনা করা এবং কম্পিউটার (Computer) শব্দের অর্থ হচ্ছে গণনাকারী। সুতরাং অভিধানিক দিক থেকে কম্পিউটারকে আমরা গণনাকারী যন্ত্র হিসাবে অভিহিত করতে পারি। কিন্তু কম্পিউটারের সাহায্যে শুধুমাত্র গণনা নয় এর মাধ্যমে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান অতি দ্রুত ও নির্ভূলভাবে করা যায়।এক কথায় কম্পিউটারকে সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত কঠিন। তারপরও আমরা নিম্নলিখিতভাবে কম্পিউটারকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। কম্পিউটার হল বিভিন্ন গাণিতিক ও যুক্তিমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি একটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র। কম্পিউটারের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতি গাণিতিক কাজ অতি দ্রুত ও নির্ভূলভাবে করা যায়। তাছাড়াও গাণিতিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজ অতি দ্রুত ও নির্ভরতার সাথে কম্পিউটার সম্পন্ন করতে পারে।

> কম্পিউটার হল গাণিতিক ও যুক্তিমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি একটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র।

কম্পিউটারের সাথে মানুষের মৌলিক পার্থক্য হল মানুষের মত কম্পিউটারের নিজস্ব কোন বুদ্ধি বা চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। মানুষের দেয়া নির্দেশ অনুসারে এই যন্ত্র কাজ করে। কম্পিউটারের নিজস্ব স্মৃতি থাকে। কম্পিউটার বিভিন্ন তথ্যকে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখে এবং প্রয়োজনে নির্দেশ অনুযায়ী ধারণকৃত তথ্য নির্ভলভাবে এবং তড়িৎ গতিতে উপস্থাপন করতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, কম্পিউটারের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হল- বিপুল পরিমাণ তথ্য স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রাখা, নির্ভূলভাবে কাজ করা এবং অতি দ্রুত গতিতে কাজ সম্পন্ন করা।

বিভিন্ন কাজে কম্পিউটার

পূর্বেই বলা হয়েছে কম্পিউটার বিপুল পরিমাণ তথ্যকে তার স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তীতে সেই সমস্ত তথ্যকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে পারে। অতএব বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে কম্পিউটারের গুরুত্ব অকল্পনীয়। বর্তমানে আমরা কম্পিউটারের সাহায্যে ঘরে বসে খুব সহজেই পৃথিবীর এক প্রান্তের সাথে অন্য প্রান্তের যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছি। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে তা কম্পিউটারের বোতাম টিপা মাত্রই মুহূর্তের মধ্যে জানতে পারছি। শুধু যোগাযোগের ক্ষেত্রেই নয় ব্যবসা-বানিজ্য, শিল্প-কারখানা, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার দিনের পর দিন রেড়েই চলেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা আজকাল অতি সহজেই অনেক জটিল রোগ সনাক্ত করতে পারি যা কিছুদিন পূর্বেও অবাস্তব ছিল। বিনোদনের ক্ষেত্রেও কম্পিউটার এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে। এক কথায় বলা যেতে পারে কম্পিউটারের ব্যবহার বর্তমান যুগে বহুমূখী। বর্তমান বিশ্বে যে জাতির মধ্যে কম্পিউটারের ব্যবহার যত বেশি সে জাতি তত উন্নত।

কম্পিউটারে কাজ করার পদ্ধতি

পূর্বেই বলা হয়েছে কম্পিউটারের কাজ করার জন্য নিজস্ব কোন বুদ্ধি নাই। কম্পিউটারকে কাজ করার জন্য যে সমস্ত তথ্য দেয়া হয় তা তার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রাখে এবং পরবর্তীতে নির্দেশ অনুযায়ী সেই সমস্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে নির্ভূলভাবে উপস্থাপন করে থাকে। যে তথ্য বা ডাটা কাজ করার জন্য অগাম থেকে কম্পিউটারে দেয়া হয় সেই কাজটিকে বলা হয় কম্পিউটারে ইনপুট (Input) দেয়া। ইনপুট দেয়ার পর কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ অংশ বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণের পরে যে ফলাফল উপস্থাপন করে তাকে বলে আউটপুট (Output)। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে কম্পিউটারের কাজ করার পদ্ধতি আলোচনা করা যেতে পারে।

চিত্র ১.১.১ ঃ কম্পিউটারের কাজ করার পদ্ধতি

চিত্রের স্মৃতি অংশ, নিয়ন্ত্রণ অংশ এবং গাণিতিক/যুক্তি অংশ -এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত কম্পিউটারের কেন্দ্রিয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (Central Processing Unit)। একে সংক্ষেপে সিপিইউ (CPU) বলা হয়। এই অংশেই কম্পিউটারের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশ কম্পিউটারের মস্তিষ্ক স্বরূপ।

ইনপুট অংশের মাধ্যমে প্রোগ্রাম বা তথ্যকে কম্পিউটারের সিপিইউতে পাঠানো হয়। ইনপুট অংশটি প্রোগ্রাম বা তথ্যকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করার পর সংরক্ষণের জন্য স্মৃতি অংশে পাঠায়। গাণিতিক/যুক্তি অংশে প্রক্রিয়াকরণের জন্য গাণিতিক, যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজ সংগঠিত হয়। এই অংশটি কখন কি ধরনের কাজ করবে নিয়ন্ত্রণ অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়।যেহেতু কম্পিউটার একটি প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র অতএব নিয়ন্ত্রণ অংশ প্রোগ্রামের নির্দেশ সমূহকে একটির পর একটি অনুধাবনের পর নির্বাহ করে।এই অংশ কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের সমন্বয় সাধন করে। সিপিইউ-তে সমস্ত কাজ প্রক্রিয়াকরণের পর আমাদের জন্য অনুধাবনযোগ্য ফলাফল আউটপুট অংশে উপস্থাপিত হয়।

যে সমস্ত যন্ত্র কম্পিউটারে তথ্য বা ইনপুট দেবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস (Inpute Device)। যেমন কী-বোর্ড, মাউস ইত্যাদি। যে সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারের কাজের ফলাফল প্রদর্শিত হয় সেই সব যন্ত্রকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস (Output Device)। যেমন মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ক্যাবল (Cable) বা তারের সাহায্যে কম্পিউটারের সিপিইউ-এর সংগে যুক্ত থাকে।

চিত্র ১.১.২ ঃ কম্পিউটারের পূর্ণ চিত্র

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কম্পিউটার হল এক ধরনের

(ক) ছবি দেখার যন্ত্র (খ) গান শুনার যন্ত্র

(গ) গণনা যন্ত্র (ঘ) ওজন মাপার যন্ত্র

২। যে যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারে তথ্য দেয়া হয় তাকে বলে

(ক) মেমরি (খ) ইনপুট ডিভাইস

(গ) সিপিইউ (ঘ) মনিটর

৩। যে যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারের কাজের ফলাফল পাওয়া যায় তাকে বলে

(ক) কী-বোর্ড (খ) ইনপুট ডিভাইস

(গ) সিপিইউ (ঘ) আউটপুট ডিভাইস

পাঠ ২ কম্পিউটারের প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কাজের প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারের শ্রেণীভিাগ করতে পারবেন,
- আকার, আয়তন ও কাজ করার ক্ষমতা অনুসারে কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

কাজের প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ

কাজ করার প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। এনালগ কম্পিউটার (Analog computer)
২। ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer)
৩। হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer)

এনালগ কম্পিউটার (Analog Computer)

এনালগ কম্পিউটার ক্রম পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফল প্রদর্শিত করে। সাধারণত চাপ, তাপ, রোধ, উপাত্তের জন্য সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে এনালগ কম্পিউটার ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করে এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল সাধারণত প্রদর্শনের কাটা (Indicator) দিয়ে দেখানো হয় অথবা প্লটার (Plotter) যন্ত্রের সাহায্যে কাগজে গ্রাফ আকারেও পাওয়া যেতে পারে। মোটর গাড়ির গতিবেগ প্রদর্শনের মিটার এনালগ কম্পিউটারের একটি উদাহরণ। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ, চাপ, তাপ পরিমাপনের জন্য এনালগ কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer)

এই ধরনের কম্পিউটারে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের জন্য বর্ণ ও অংক ব্যবহার করা হয় এবং প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল লিখিত আকারে প্রস্তুত করা হয়। ডিজিটাল কম্পিউটারের মূল ভিত্তি হল বাইনারী সংখ্যা (০ এবং ১)। অর্থাৎ এই কম্পিউটার যাবতীয় গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ বাইনারী ডিজিটের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং প্রক্রিয়াকৃত ফলাফল বর্ণ ও অংকের মাধ্যমে লিখিত আকারে প্রকাশ করে। এনালগ কম্পিউটারের চেয়ে ডিজিটাল কম্পিউটার প্রদত্ত ফলাফল অনেক বেশি নির্ভূল ও নির্ভরশীল। এর কাজের গতিও বেশ দ্রুত। আমাদের চারপাশে আমরা যে সমস্ত কম্পিউটার দেখি সেগুলো ডিজিটাল কম্পিউটার। ডিজিটাল কম্পিউটারে লেখালেখি, হিসাব নিকাশ, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রভৃতি কাজ একইসংগে করা যায়। কাজের ধরন অনুযায়ী ব্যবহারিক কর্মসূচি (Application Programme) ব্যবহার করতে হয়।

হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid Computer)

এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সমন্বয়ে তৈরি হয় সংকর বা হাইব্রিড কম্পিউটার। প্রথম দিকের হাইব্রিড কম্পিউটারের এনালগ অংশই থাকতো মুখ্য, ডিজিটাল অংশ সহায়ক ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু বর্তমানে হাইব্রিড কম্পিউটার ডিজিটাল প্রধান। সাধারণত বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের জন্য হাইব্রিড কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধারণত কম্পিউটার বলতে ডিজিটাল কম্পিউটারকেই বোঝানো হয়ে থাকে এবং এই পুস্তকে আলোচনার বিষয়বস্তু হল ডিজিটাল কম্পিউটার।

আকার, আকৃতি, দক্ষতা, ক্ষমতা ও কার্যকারিতা প্রভৃতির ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়।

১। অতিবৃহৎ কম্পিউটার (Super Computer)
২। বৃহৎ কম্পিউটার (Mainframe Computer)
৩। ছোট কম্পিউটার (Mini Computer)
৪। ক্ষুদ্র কম্পিউটার (Micro Computer)

অতিবৃহৎ কম্পিউটার (Super Computer)

এই ধরনের কম্পিউটার আকার ও আকৃতিতে বেশ বড় এবং একই সংগে অসংখ্য কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এই কম্পিউটারকে সুপার কম্পিউটার বলে। সুপার কম্পিউটার অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন এবং অসম্ভব শক্তিশালী। এই কম্পিউটারে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত মেমরি এবং বিপুল পরিমাণ প্রক্রিয়াকরণ কাজের ক্ষমতা থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বৃহৎ কোম্পানি, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে সুপার কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। CRAY-1, CYBER-205 প্রভৃতি সুপার কম্পিউটারের উদাহরণ।

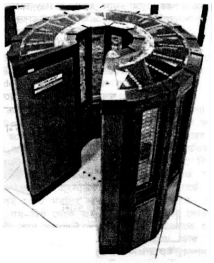

চিত্র ১.২.১ঃ ক্রে-১ সুপার কম্পিউটার

বৃহৎ কম্পিউটার (Mainframe Computer)

সুপার কম্পিউটারের তুলনায় ছোট কম্পিউটারকে বৃহৎ কম্পিউটার বা মেইনফ্রেম কম্পিউটার বলে। এই কম্পিউটার অনেক রকম ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্র এবং অনেক রকম সহায়ক স্মৃতির সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারে। ফলে এই কম্পিউটারের সাথে অনেকগুলো ছোট কম্পিউটার যুক্ত করে একসঙ্গে অনেক মানুষ কাজ করতে পারে। এই কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ও ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। Amdah 1580, IBM 4341, UNIVAC 1100/01, NCRN 8370 প্রভৃতি বৃহৎ কম্পিউটারের উদাহরণ।

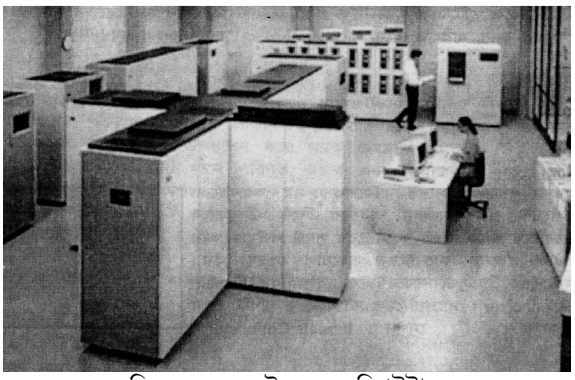

চিত্র ১.২.২ঃ মেইনফ্রেম কম্পিউটার

ছোট কম্পিউটার (Mini Computer)

মেইনফ্রেম কম্পিউটারের তুলনায় ছোট এবং কম ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটারকে বলা হয় মিনি কম্পিউটার। মিনি কম্পিউটারকে একটি বড় টেবিলের উপর বসানো যায়। মিনি কম্পিউটারে টার্মিনাল যোগ করে অর্ধ শতাধিক ব্যবহারকারী একসংগে কাজ করতে পারে। NOVA 3, PDP II, IBM-AS/400 প্রভৃতি মিনি কম্পিউটারের উদাহরণ।

ক্ষুদ্র কম্পিউটার (Micro Computer)

পূর্বে কম্পিউটার তৈরি করতে অসংখ্য ট্রানজিস্ট্রর, রেজিষ্ট্যান্স, ডায়োড ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে ইনটেল নামক একটি প্রতিষ্ঠান ইনটেল-৪০০৪ (Intel 4004) নামক প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর বা ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াকারক (Microprocessor) তৈরি করে।এই ক্ষুদ্রাকৃতি মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি ক্ষুদ্রকারের কম্পিউটারকে মাইক্রোকম্পিউটার নামে অভিহিত করা হয়।ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াকারকের সাথে স্মৃতি অংশ এবং ইনপুট-আউটপুট অংশের সংযোগ সাধন করা হয়। এই কম্পিউটার সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় এবং একজন ব্যবহারকারী একাই একটি কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারেন। এজন্য এই কম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার (Personal Computer) বা সংক্ষেপে পিসি (PC) বলা হয়। IBM 486, IBM Pentium প্রভৃতি মাইক্রোকম্পিউটারের উদাহরণ।

মাইক্রোকম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার (Personal Computer) বা সংক্ষেপে পিসি (PC) বলা হয়।

মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটারকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন সুপার মাইক্রো, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক ইত্যাদি।

সুপার মাইক্রোকম্পিউটার সবচেয়ে শক্তিশালী মাইক্রোকম্পিউটার।এটি ওয়ার্কস্টেশন নামে পরিচিত।ওয়ার্কস্টেশন মাইক্রোকম্পিউটার ও মিনি কম্পিউটারের মাঝে একটি সেতু বন্ধন স্বরূপ। এটি দ্বারা মিনি কম্পিউটারের প্রায় সমস্ত কাজই করা যায় কিন্তু দামের দিক থেকে অত্যন্ত সস্তা।

প্রচলিত সাইজের ডেস্কের উপর রেখে ডেস্কটপ কম্পিউটারে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে কাজ করা যায়। ল্যাপটপ কম্পিউটার দেখতে আকারে ছোট সাইজের ব্রিফ কেইসের মত। এটিকে কোলের উপরে রেখেও কাজ করা যায়। নোটবুক কম্পিউটার আকারে নোটবুক বা ডয়েরীর মত।এতে তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা সহ কম্পিউটারের সব অংশ বিদ্যমান। নোটবুক কম্পিউটারকে প্রিন্টার সহ অন্যান্য সরঞ্জামের সাথে সহজে যুক্ত করা যায়। এটি গাড়ির ব্যাটারিতেও চলে।

ল্যাপটপ কম্পিউটার

নোটবুক কম্পিউটার

চিত্র ১.২.৩ ঃ ল্যাপটপ ও নোটবুক কম্পিউটার

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কাজ করার প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারকে ভাগ করা হয়

(ক) দুই ভাগে (খ) তিন ভাগে
(গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে

২। আকার, আকৃতি, দক্ষতা, ক্ষমতা, কার্যকারিতা প্রভৃতির ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে ভাগ করা হয়

(ক) দুই ভাগে (খ) তিন ভাগে
(গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে

৩। ডিজিটাল কম্পিউটারের মূল ভিত্তি হল

(ক) পূর্ণ সংখ্যা (খ) দশমিক সংখ্যা
(গ) ভগ্নাংশ (ঘ) বাইনারী সংখ্যা

৪। মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি হয় কত সালে

(ক) ১৯৬৮ (খ) ১৯৬৯
(গ) ১৯৭০ (ঘ) ১৯৭১

পাঠ ৩ হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সম্পর্কে অবহিত হবেন,
- কম্পিউটারের সফট্ওয়্যার সম্পর্কে অবহিত হবেন।

হার্ডওয়্যার (Hardware)

কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশকে হার্ডওয়্যার বলে। ছোট, বড়, অতি গুরুত্বপূর্ণ, কম গুরুত্বপূর্ণ যেমন যন্ত্রই হোক না কেন, যন্ত্র মানেই হার্ডওয়্যার। হার্ডওয়্যার হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা যায়। কী-বোর্ড, মনিটর, প্রিন্টার, মাউস, সিলিকন চিপ ইত্যাদি হার্ডওয়্যারের অংশ। হার্ডওয়্যারকে কম্পিউটারের দেহ বলা যেতে পারে। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১। ইনপুট ইউনিট (Input Unit)

২। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (Central Processing Unit)

৩। আউটপুট ইউনিট (Output Unit)

কম্পিউটার ইনপুট ইউনিটের সাহয্যে তথ্য বা নির্দেশ গ্রহণ করে থাকে। ইনপুট ডিভাইস বিভিন্ন ধরনের তথ্য সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশে পাঠায়। সিপিইউ প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফলাফল আউটপুট ডিভাইসে প্রদর্শন করে।

কম্পিউটারের সিপিইউ আবার তিনটি অংশে বিভক্ত। যথাঃ নিয়ন্ত্রন অংশ (Control Unit), গাণিতিক-যুক্তিক অংশ (Arithmetic-logic Unit) এবং স্মৃতি (Memory)। কম্পিউটারে সাধারনত দুই ধরনের স্মৃতি থাকে। যথাঃ-

১। প্রধান স্মৃতি (Main Memory)

২। সহায়ক স্মৃতি (Auxiliary Memory)

সফট্ওয়্যার (Software)

হার্ডওয়্যারকে যদি কম্পিউটারের দেহ বলা যায় তাহলে সফট্ওয়্যার হল কম্পিউটারের প্রাণ। প্রাণ ছাড়া যেমন দেহ অচল তেমন সফট্ওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার কোন কাজ করতে পারে না। সফট্ওয়্যার অদৃশ্য শক্তি। এটিকে ধরা বা ছোঁয়া যায় না।এটি বিদ্যুৎ বাহিত নির্দেশনার সমষ্টি। ক্যাসেটের ফিতায় যেমন গান রেকর্ড করা থাকে ঠিক তেমনি ডিস্ক বা টেপে সফট্ওয়্যার রেকর্ড করা থাকে। ডিস্ক বা টেপে রেকর্ডকৃত তথ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গের আকারে সিপিইউতে পৌঁছে।

> হার্ডওয়্যারকে যদি কম্পিউটারের দেহ বলা যায় তাহলে সফট্ওয়্যার হল কম্পিউটারের প্রাণ।

সফট্ওয়্যার প্রধানত দুই ধরনের। এর একটি হল অপারেটিং সিস্টেম (Operating System) বা সিস্টেম সফট্ওয়্যার (System Software) এবং অপরটি হল ব্যবহারিক কর্মসূচি বা এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম (Application Programme)।

অপারেটিং সিস্টেম বা সিস্টেম সফট্ওয়্যার হল কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রক।এটি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র রচনা ও রক্ষা করে। সিস্টেম সফট্ওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার চালু করা যায় না। অপারেটিং সিস্টেম বা সিস্টেম সফট্ওয়্যার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তার মধ্যে Dos, Windows এবং Xenix/Unix বহুলভাবে ব্যবহৃত। Compiler, Interpretor, Assembler প্রোগ্রাম সমূহও সিস্টেম সফট্ওয়্যারের অর্ন্তগত।

> অপারেটিং সিস্টেম বা সিস্টেম সফট্ওয়্যার হল কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রক।

এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বিশেষ ধরনের কাজ বা ব্যবহারিক কাজের জন্য তৈরি সফট্ওয়্যার। চিঠিপত্র লেখা, বই, সংবাদপত্র ইত্যাদি ছাপানোর জন্য ওয়ার্ড প্রসেসিং (Word Processing) প্যাকেজ যথা- ওয়ার্ড পারফেক্ট (Word Perfect), ওয়ার্ড

স্টার (Word Star), মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (Microsoft Word) ইত্যাদি এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্প্রেডসিট এ্যানালাইসিস (Spreadsheet Analysis) প্যাকেজ যেমন- লোটাস (Lotus), মাইক্রোসফট এক্সেল (Microsoft Excel) ইত্যাদি এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। এরূপ অসংখ্য কাজ সম্পাদনের জন্য অসংখ্য এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম আছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কম্পিউটারের সিপিইউ কয়টি অংশে বিভক্ত

(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। কম্পিউটারের স্মৃতি কয় ধরনের

(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৩। সফট্ওয়্যার প্রধানত কয় ধরনের

(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

পাঠ ৪ প্রাচীন গণনা পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রচীন গণনা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করবেন।

প্রাচীন গণনা পদ্ধতি

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ চেষ্টা চালিয়ে গেছে কিভাবে হিসাব নিকাশ সহ অন্যান্য যাবতীয় কাজ অতি সহজে করা যায়। প্রচীন কাল থেকেই মানুষ গণনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। এক সময় মানুষ গণনার জন্য নুড়ি, ঝিনুক, দড়ির গিট ইত্যাদি ব্যবহার করতো। এখনও আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহর অঞ্চলের মানুষও গণনার জন্য আঙ্গুলের গিট ব্যবহার করে। রোমান ভাষায় নুড়িকে বলা হয় ক্যালকুলি (Calculi) এবং এই ক্যালকুলি শব্দ থেকেই ক্যালকুলেট (Calculate) শব্দের উৎপত্তি। ক্যালকুলেট শব্দের অর্থ গণনা করা। গণনা কার্যের জন্য যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন, গণনার জন্য যন্ত্র বা যান্ত্রির পদ্ধতির ব্যবহারের ইতিহাস শুরু হয় অ্যাবাকাস (Abacus) যন্ত্র থেকে।

রোমান ভাষায় নুড়িকে বলা হয় ক্যালকুলি (Calculi) এবং এই ক্যালকুলি শব্দ থেকেই ক্যালকুলেট (Calculate) শব্দের উৎপত্তি।

অ্যাবাকাস (Abacus)

অ্যাবাকাস সবচেয়ে প্রচীন গণনাযন্ত্র, যার মধ্যে গুটি (Beads) ব্যবহৃত হয়। গুটিগুলো একটি ফ্রেমের উপর বসানো তারের মধ্যে লাগানো থাকে। এখনও পৃথিবীর অনেক জায়গায় অ্যাবাকাস ব্যবহার করা হয়। অ্যাবাকাস কখন কোন দেশে প্রথম চালু হয় তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশত অব্দে চিনে অ্যবাকাসের প্রচলন ছিল বলে অনেকে মনে করেন।প্রাচীন গ্রীসেও এই যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। যদিও চিনে অ্যাবাকাসের প্রথম প্রচলন ছিল বলে মনে করো হয়, তবুও ত্রয়োদশ শতাব্দির আগে এটা চিন দেশে খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দিতে এটা জাপানে প্রবর্তিত হয় এবং তার একটি পরিমার্জিত সংস্করণ উনবিংশ শতাব্দিতেও ব্যবহৃত হত।চিনে অ্যাবাকাসকে বলা হয় সুয়ান পান (Suan-pan), জাপানে একে বলা হয় সরোবান (Soroban) এবং রাশিয়াতে বলা হয় স্কেটিয়া (Sketia)।

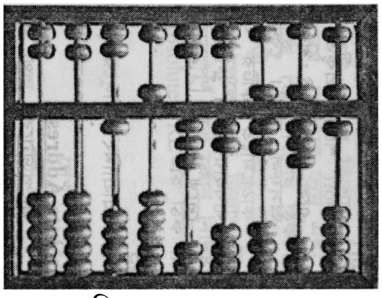

চিত্র ১.৪.১ ঃ অ্যাবাকাস

চিনা অ্যাবাকাস যন্ত্রে ৭টি দন্ড থাকে। প্রত্যেক দন্ডের উপরের অংশে দুইটি এবং নিচের অংশে পাঁচটি করে গুটি থাকে। আড়াআড়ি একটি ফ্রেমের সাহায্যে উপরের ও নিচের অংশ পৃথক থাকে। উপরের প্রতিটি গুটির মান পাঁচ এবং নিচের প্রতিটি গুটির মান এক। উপরের গুটিগুলো উপরের ফ্রেমের দিকে এবং নিচের গুটিগুলো নিচের ফ্রেমের দিকে থাকে। গণনার সময় উপরের গুটিগুলো মাঝখামের ফ্রেমের দিকে নামিয়ে আনতে হয় এবং নিচের গুটিগুলো মাঝখানের ফ্রেমের দিকে উঠিয়ে নিতে হয়। এরপর উপরের ও নিচের গুটির মান অনুযায়ী সংখ্যা ধরে গণনার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

জাপানি সরোবান চিনা অ্যাবাকাসের মতই। এখানে প্রতিটি দন্ডে গুটির সংখ্যা মোট পাঁচটি। তারমধ্যে উপরের অংশে একটি এবং নিচের অংশে চারটি। উপরের প্রতিটি গুটির মান পাঁচ এবং নিচের প্রতিটি গুটির মান এক। গণনা পদ্ধতি একই।

নেপিয়ারের হাড় (Napires' bone)

১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের গণিতবিদ জন নেপিয়ার (John Napier) লগারিদমের সারণী আবিষ্কার করেন। গণনা কৌশলের জন্য এটা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। তিনিই ১৬১৭ সালে দাগকাটা এবং সংখ্যা বসানো একপ্রকার কাঠি ব্যবহার করে এক ধরনের গণনাযন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই কাঠি নেপিয়ারের হাড় (Napiers' bone) নামে পরিচিত। মোট নয়টি কাঠির গায়ে ক্রম অনুযায়ী সংখ্যা বিন্যাস করা থাকতো এবং গণনার ধরন অনুযায়ী কাঠিগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে গণনার কাজ করতে হতো। তার এ যন্ত্র দিয়ে গুণ, ভাগ, বর্গমূল ইত্যাদি নির্ণয় করা যেত।

নেপিয়ারের লগারিদম ব্যবহার করে ১৬৩০ সালে উইলিয়ম অটরেড (William Oughtred) প্রথম স্লাইড রুল আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে আইজ্যাক নিউটন ও অ্যামিদি মেন হেইম এর উন্নতি সাধন করেন। ১৬৪২ সালে উনিশ বৎসর বয়স্ক ফরাসি গণিতবিদ ব্লেইজ প্যাসকেল (Blaise Pascal) একটি যান্ত্রিক গণনাযন্ত্র তৈরি করেন। প্যাসকেলের বাবা ছিলেন শুল্ক বিভাগের একজন কর্মচারী। তাকে অনেক বড় ও কঠিন হিসাবের কাজ করতে হত। বাবাকে সাহায্য করার জন্য প্যাসকেল এই যন্ত্র তৈরি করেন। তিনি এই যন্ত্রে গিয়ার চালিত গণনের চাকা ব্যবহার করে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তাঁর যন্ত্রে ছিল আটটি চাকা এবং প্রতিটি চাকায় ছিল দশটি করে দাত। প্যাসকেলের এই যন্ত্রে শুধু যোগ ও বিয়োগ করা সম্ভব ছিল। প্যাসকেল গণিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং তিনিই প্রথম পুনঃ পুনঃ যোগের মাধমে গুণনের উপায় উদ্ভাবন করেন। প্যাসকেলের গণনা যন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে পরবর্তী তিনশত বৎসর ধরে যত ক্যালকুলেটর বা যান্ত্রিক গণনা যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে তাতে গিয়ার চালিত চাকা ব্যবহার করা হয়েছে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অ্যাবাকাস হল এক ধরনের
- (ক) উচ্চতা মাপার যন্ত্র
- (খ) ওজন মাপার যন্ত্র
- (গ) গণনা যন্ত্র
- (ঘ) তাপমান যন্ত্র

২। চিনা অ্যাবাকাস যন্ত্রে দন্ড থাকে
- (ক) তিনটি
- (খ) পাঁচটি
- (গ) সাতটি
- (ঘ) দুইটি

৩। লগারিদমের সারণী আবিষ্কার করেন
- (ক) উইলিয়াম অটরেড
- (খ) জন নেপিয়ার
- (গ) ব্লেইজ প্যাসকেল
- (ঘ) আইজ্যাক নিউটন

পাঠ ৫ কম্পিউটারের বিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কম্পিউটারের বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

কম্পিউটারের বিবর্তন

প্রাথমিক যুগ

কম্পিউটার উদ্ভাবন ও বিস্তারের পিছনে রয়েছে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণার ফলাফল। বলা যায় গণনার প্রচেষ্টা কম্পিউটার উদ্ভাবনের প্রাচীনতম ঘটনা। প্রাচীনকালে মানুষ গণনার জন্য নুড়ি, ঝিনুক, দড়ির গিট ইত্যাদি ব্যবহার করতো। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ অব্দে প্রথম গণনাযন্ত্র অ্যাবাকাস প্রচলন হয়। এরপর সময় পবিবর্তনের সাথে সাথে গণনাযন্ত্রেরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ব্লেইজ প্যাসকেল আবিস্কৃত গিয়ার চালিত গণনাযন্ত্র এক নতুন যুগের সূচনা করে। পরবর্তীতে ১৬৭১ সালে জার্মান গণিতবিদ গটফ্রাইড উইলহেম লিবনিজ (Gottfried Wilhelm Leibnitz) চাকা ও দন্ড ব্যবহার করে গুণ ও ভাগের ক্ষমতা সম্পন্ন যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। সেই সময় কৌশল তত উন্নত ছিল না এবং ক্যালকুলেটরের উপযুক্ত সুক্ষ্ণ যন্ত্রাংশ তৈরি অসম্ভব ছিল বিধায় এই যন্ত্র নির্ভরযোগ্য মনে হতোনা। পরবর্তীতে যান্ত্রির কৌশলের উন্নতির ফলে ক্যালকুলেটরের গুণগত মান উন্নত হয় এবং এই যন্ত্র নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠে।

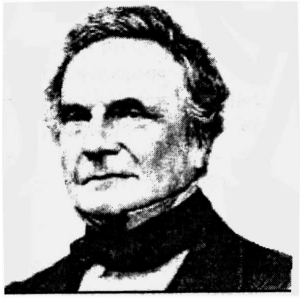

চিত্র ১.৫.১ ঃ চার্লস ব্যাবেজ

১৭৮৬ সালে জার্মানির মুলার "ডিফারেন্স ইঞ্জিন" নামে পরিচিত একটি কালকুলেটর বা গণনাযন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেন। এর প্রায় দুই যুগ পর ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) ১৮১২ সালে লগারিদমিক হিসাবসহ গাণিতিক হিসাবের জন্য আরও উন্নত একটি ডিফারেন্স ইঞ্জিন তৈরির পরিকল্পনা করেন। আর্থিক অনুদান বন্ধের কারণে বিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৮৩২ সালে তিনি এই কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তার পরিকল্পনার উপযুক্ত বিপুল পরিমাণ যান্ত্রিক সরঞ্জাম তৈরি করাও সেই সময়ে সম্ভবপর ছিল না।

এরপর ১৮৩৩ সালে ব্যাবেজ "এ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন" নামে একটি যান্ত্রিক কম্পিউটার তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ইঞ্জিনের নকশা তৈরি করেন। সফল যন্ত্র তৈরি করতে বিলম্ব হওয়ায় সরকার অনুদান বন্ধ করে দিলেও ১৮৭১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিজ খরচে তনি গবেষণা চালিয়ে যান। ব্যাবেজের এ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের পরিকল্পনায় আধুনিক কম্পিউটারের ধারণা ছিল। এজন্য ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়।ব্যাবেজ আধুনিক কম্পিউটারের মত তার যন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ অংশ, গাণিতিক অংশ, স্মৃতি, ইনপুট ও আউটপুট অংশগুলো চিহ্নিত করেন। স্মৃতি অংশে পঞ্চাশ অংক দৈর্ঘের এক হাজার সংখ্যা ধরানোর পরিকল্পনা ছিল।পরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চাশ অংকের দুইটি সংখ্যার যোগ বা বিয়োগের জন্য এক সেকেন্ড এবং গুণের জন্য এক মিনিট সময় লাগার কথা ছিল।

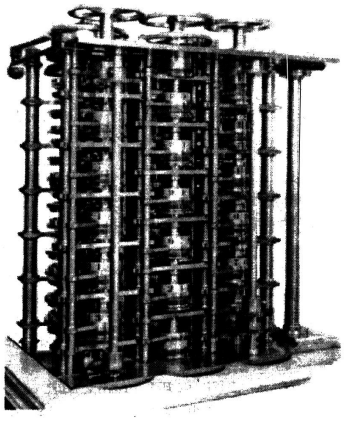

চিত্র ১.৫.২ ঃ ব্যাবেজের ডিফারেন্স ইঞ্জিন

চার্লস ব্যাবেজের এ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের পরিকল্পনায় আধুনিক কম্পিউটারের ধারণা ছিল। এজন্য ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

চার্লস ব্যাবেজের পরিকল্পনায় আধুনিক কম্পিউটারের ধারণা থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যাপারে তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। সত্যিকার অর্থে ১৯৪০ এর দশকে আধুনিক কম্পিউটার উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলে। ১৯৪০ সালে আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরীর (Bell Laboratory) গণিতবিদ ও গবেষক ডঃ জর্জ আর স্টিবিজ (George R Stibitz) কমপ্লেক্স কম্পিউটার (Complex Computer) নামে একটি রিলে কম্পিউটার তৈরি করেন। ১৯৪০ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত বেল ল্যাবরেটরীতে এই সফল যন্ত্রটি প্রদর্শন করা হয়। এরপর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পর্ব শুরু হয় ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল যন্ত্র দিয়ে।

ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল যুগ

কিছু কিছু ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ যেমন ভালব আবিস্কৃত হওয়ার পর কম্পিউটারের সংগে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশের ব্যবহার শুরু হয়।যান্ত্রিক ও ইলেক্ট্রনিক উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত কম্পিউটারকে ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল কম্পিউটার বলে। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ডঃ হাওয়ার্ড এইচ আইকেন (Dr. Howard H Aeiken) ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন (International Business Machine – IBM) কোম্পানিক চারজন প্রকৌশলী জে ডব্লিউ ব্রাইস (J W Bryce), বি এম ডারফি (B M Darfee), এফ ই হ্যামিলটন (F E Hamilton) এবং সি ডি লেক (C D Lake) এর সহায়তায় Automatic Sequence Control Calculator (ASCC) নামে একটি ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেন। ১৯৪৪ সালে আই বি এম মার্ক-১ (Mark-1) নামে এটি বাজারজাত বা বিক্রয় করতে শুরু করেন। মার্ক-১ যন্ত্রের সাহায্যে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা যেত। মার্ক-১ কম্পিউটারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল-

১. মার্ক-১ পৃথিবীর প্রথম স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র
২. এটির সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ছাড়াও অনেক জটিল গাণিতিক কাজ করা যেত।
৩. এটির দৈর্ঘ ছিল ৫১ ফুট এবং উচ্চতা ছিল ৮ ফুট।
৪. এতে সাত লক্ষেরও অধিক যন্ত্রাংশ সংযোগের জন্য প্রায় ৫০০ মাইল লম্বা তার ব্যবহার করা হয়েছিল।
৫. এর ওজন ছিল প্রায় ৫ টন।

মার্ক-১ পনের বৎসর পর্যন্ত চালু ছিল। এটি প্রদর্শনের জন্য বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

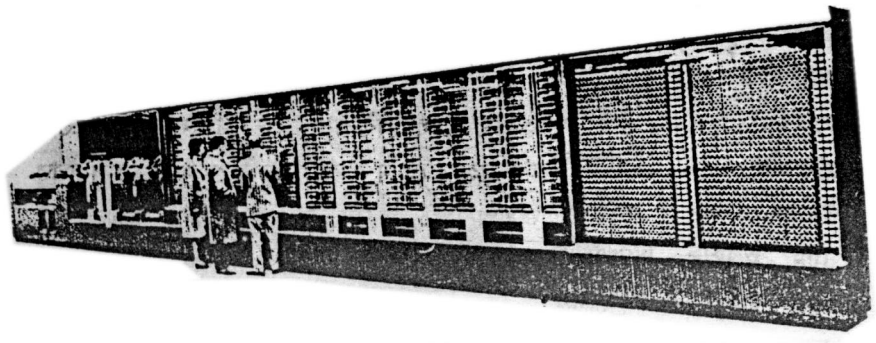

চিত্র ১.৫.৩ ঃ মার্ক-১ কম্পিউটার

ইলেক্ট্রনিক যুগ

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানি ডঃ জন এ্যাটানাস্ফ্ তার নিজের এবং ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য ১৯৪২ সালে বায়ুশূন্য টিউব ব্যবহার করে একটি ছোট ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার তৈরি করেছিলেন। এ্যাটানাস্ফ্ ও তাঁর সহকারী ব্যারীর নামানুসারে এই কম্পিউটারটি এ্যাটানাস্ফ্-ব্যারী কম্পিউটার (সংক্ষেপে ABC) নামে পরিচিত। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জন মউসলি (Dr. John W Mouchley)

এবং তাঁর ছাত্র প্রেসপার একার্ট (Dr. J Presper Eckert) ইলেক্ট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটর এন্ড ক্যালকুলেটর বা সংক্ষেপে ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) নামক কম্পিউটারটি উদ্ভাবন করেন। ENIAC এর জন্য ১৫০০ বর্গফুট পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন হত এবং এটির ওজন ছিল ৩০ টন। যন্ত্রটি ১৯০০০ বায়ুশূন্য ইলেক্ট্রনিক টিউব দিয়ে নির্মিত হয়েছিল এবং যন্ত্রটি চালনার জন্য ১৩০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হতো। এই যন্ত্রটি নয় বৎসর চালু ছিল।

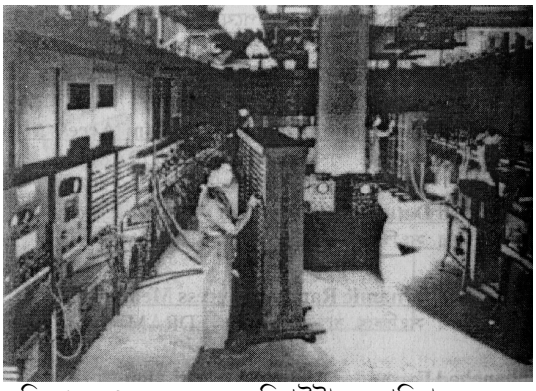
চিত্র ১.৫.৪ ঃ ENIAC কম্পিউটারের পরিচালন কক্ষ

এনিয়াক কম্পিউটারের প্রোগ্রামের জন্য তারযুক্ত প্লাগবোর্ড ব্যবহার করা হত। প্রোগ্রামিংয়ের জন্য তারের সংযোগ বদলানোর প্রয়োজন হতো এবং শত শত সংযোগ বদলানোর জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত সময় লেগে যেত। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ১৯৪৯ সালে যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মরিস উইলথিম সংরক্ষিত প্রোগ্রাম বিশিষ্ট প্রথম কম্পিউটার EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) তৈরি করেন।

১৯৪৮ সালে ট্রানজিস্ট্রর (Transistor) আবিষ্কারের ফলে কম্পিউটারে নবযুগের সূচনা হয়। ভালবের পরিবর্তে ট্রানজিস্ট্রর ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারের আকার ছোট হয়ে আসে এবং কর্মক্ষমতাও বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলোজিতে হোয়ার্লউইন্ড-১ কম্পিউটার নির্মাণের কাজ শেষ হয় ১৯৫১ সালে।একই বৎসর ENIAC-এর নির্মাতারা UNIVAC (Universal Automatic Calculator) কম্পিউটারের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। UNIVAC-ই সর্বপ্রথম বানিজ্যিক ভিত্তিতে নির্মিত ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার। এই যন্ত্রে সর্বপ্রথম চুম্বক ফিতা ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পর থেকেই কম্পিউটারের বানিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় এবং সেই সংগে সংগে কম্পিউটার দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ডিফারেন্স ইঞ্জিন তৈরির পরিকল্পনা করেন প্রথম
(ক) ব্লেইজ প্যাসকেল (খ) আইজ্যাক নিউটন
(গ) উইলহেম লিবনিজ (ঘ) মুলার

২। আধুনিক কম্পিউটারের জনক কে
(ক) জর্জ আর স্টিবিজ (খ) হাওয়ার্ড এইচ আইকেন
(গ) চার্লস ব্যবেজ (ঘ) মুলার

৩। মার্ক-১ কম্পিউটারের দৈর্ঘ্য ছিল
(ক) ৫০ ফুট (খ) ৬০ ফুট
(গ) ৫১ ফুট (ঘ) ৬৫ ফুট

৪। পৃথিবীর প্রথম স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্রের নাম ছিল
(ক) ENIAC (খ) মার্ক-১
(গ) UNIVAC (ঘ) EDSAC

৫। ENIAC-এর ওজন ছিল
(ক) ২০টন (খ) ৩০ টন
(গ) ৪০ টন (ঘ) ৫০ টন

৬। ট্রানজিস্ট্রর আবিষ্কার হয়
(ক) ১৯৪৪ সালে (খ) ১৯৪৬ সালে
(গ) ১৯৪৭ সালে (ঘ) ১৯৪৮ সালে

৭। বানিজ্যিক ভিত্তিতে নির্মিত প্রথম ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটারের নাম
(ক) ENIAC (খ) EDSAC
(গ) UNIVAC (ঘ) Mark-1

৮। মার্ক-১ এর উচ্চতা ছিল
(ক) ৪ ফুট (খ) ৩ ফুট
(গ) ৫ ফুট (ঘ) ৮ ফুট

পাঠ ৬ কম্পিউটারের প্রজন্ম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- প্রজন্ম হিসাবে কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

কম্পিউটারের প্রজন্ম

সময়ের সাথে সাথে কম্পিউটারের গতি, তথ্য ধারণ ক্ষমতা, হিসাব করার ক্ষমতা ইত্যাদির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের ধারা বর্তমানেও বিদ্যমান। পরিবর্তন ও বিকাশের এক একটি পর্যায় বা ধাপকে প্রজন্ম (Generation) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি প্রজন্মে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যারে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।প্রজন্ম হিসাবে কম্পিউটারকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। নিম্নে প্রজন্মের ভিত্তিতে কম্পিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করা হল।

প্রজন্ম হিসাবে কম্পিউটারকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম প্রজন্ম (First Generation 1942-1959)

১৯৪২ হতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত আবিস্কৃত কম্পিউটারকে সাধারণত প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার বলা হয়। এই সময়ে কম্পিউটারের মূল যন্ত্রাংশ ছিল বায়ুশূন্য ভালব। ভালবগুলো আকারে অনেক বড় ছিল এবং এগুলোর ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ খরচ হতো অত্যন্ত বেশি। এগুলো ব্যবহারের ফলে তাপমাত্রা এত বেশি বেড়ে যেত যে কম্পিউটার পরিচালনার সময় কম্পিউটার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার তাপমাত্রা অসহনীয় হয়ে যেত। এই সমস্ত কম্পিউটারে তথ্য ধারণ ক্ষমতা ছিল সীমিত এবং উপাত্ত সমস্যাও ছিল। এর পর ধীরে ধীরে তথ্য ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে বায়ুশূন্য টিউবের পরিবর্তে চৌম্বক ধর্মী বস্তু আসতে শুরু করলো। এবিসি (ABC), এনিয়াক (ENIAC), এডসেক (EDSAC), ইউনিভ্যাক (UNIVAC) প্রভৃতি প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার।

১৯৪২ হতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত আবিস্কৃত কম্পিউটারকে সাধারণত প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার বলা হয়। এবিসি (ABC), এনিয়াক (ENIAC), এডসেক (EDSAC), ইউনিভ্যাক (UNIVAC) প্রভৃতি প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার।

দ্বিতীয় প্রজন্ম (Second Generation 1959-1965)

১৯৫৯ সাল হতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আবিস্কৃত কম্পিউটারেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার হিসাবে ধরা হয়। ট্রানজিস্ট্রর আবিষ্কার হওয়ার ফলে এই প্রজন্মের কম্পিউটারে বায়ুশূন্য ভালবের পরিবর্তে ট্রানজিস্ট্রর ব্যবহৃত হয়। ট্রানজিস্ট্ররে কোন চলমান অংশ নেই এবং এর কাজ সুইচের মত। ফলে এই প্রজন্মের কম্পিউটারে ট্রানজিস্ট্রর ব্যবহারের ফলে কম্পিউটারের আকার ছোট হয়, দাম কমে যায়, কম্পিউটারের গতি বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণও অনেক কমে যায়। এই সময়ে কম্পিউটারের তাপ সমস্যার সমাধান হয়। চুম্বকীয় কোর স্মৃতি এবং উচ্চ গতিসম্পন্ন ইনপুট-আউটপুট অংশ এই সময়ে কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারেই প্রথম উচ্চতর প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন ফোরট্রান (FORTRAN), কোবল (COBOL) ইত্যাদির উদ্ভব ও প্রচলন শুরু হয়। IBM-1400, CDC 1604, RCA 301, RCA 501, NCR 300, GE 200 ইত্যাদি দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার।

১৯৫৯ সাল হতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আবিস্কৃত কম্পিউটারেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার হিসাবে ধরা হয়। IBM-1400, CDC 1604, RCA 301, RCA 501, NCR 300, GE 200 ইত্যাদি দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার।

তৃতীয় প্রজন্ম (Third Generation 1965-1971)

১৯৬৫ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আবিস্কৃত কম্পিউটারকে তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার হিসাবে ধরা হয়। একীভূত বর্তনী (integrated Circuit), অর্ধপরিবাহী স্মৃতি, উন্নত কার্যকারিতা, নির্ভরশীলতা এই প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য।একীভূত বর্তনীতে অনেক ট্রানজিস্ট্রর, অর্ধপরিবাহী ডায়োড এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ থাকে। ফলে

কম্পিউটারের আকার আরও ছোট হয়, দাম কমে, কাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যুৎ খরচ কমে যায়। এই প্রজন্মের কম্পিউটারের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে- অধিক সংখ্যক ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস সংযোজন, অধিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা, সুর ও শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা, তারের সাহায্যে দূরবর্তী কোন কম্পিউটারের সাথে তথ্য আদান প্রদান ক্ষমতা ইত্যাদি। এই সময়ে মিনি কম্পিউটারের উদ্ভব ঘটে। এই প্রজন্মে উচ্চতর ভাষার প্রচলন এবং নির্বাহী পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটে। IBM 360, IBM 370, PDP II, GE 600 ইত্যাদি তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার।

১৯৬৫ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আবিস্কৃত কম্পিউটারকে তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার হিসাবে ধরা হয়। IBM 360, IBM 370, PDP II, GE 600 ইত্যাদি তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার।

চতুর্থ প্রজন্ম (Fourth Generation 1971-)

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের সময়কাল হল ১৯৭১ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই সময়ে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় এবং প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাও অধিক বৃদ্ধি পায়। ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইনটেল কোম্পানি এমএসসি-৪ (MSC-4) নামে একটি মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করে। এই মাইক্রোপ্রসেসরে মোট ২২০০ টি ট্রানজিস্ট্রর ব্যবহার করা হয়েছিল। মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের ফলে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটকে মাত্র একটি চিপে (Chip) ধারণ করা সম্ভব হয়। বর্তমানে প্রায় ১ বর্গ ইঞ্চির একটিমাত্র চিপে ৩০ লাখ পর্যন্ত ট্রনজিস্ট্রর সন্নিবেশিত করে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৃহদাকার একীভূত বর্তনী ব্যবহার, অধিক তথ্য ধারণ ক্ষমতা, উন্নত কার্যকারিতা ও নির্ভলশীলতা। এই সময়ই প্যাকেজ প্রোগ্রামের প্রচলন শুরু হয়। এই সময় মাইক্রোকম্পিউটারের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে। উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য কম্প্যাক্ট ডিস্ক (Compact Disc) বা সিডি (CD) তৈরি হয়। IBM PS/2, Apple Macintosh ইত্যাদি চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার।

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের সময়কাল হল ১৯৭১ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত। IBM PS/2, Apple Macintosh ইত্যাদি চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার।

পঞ্চম প্রজন্ম (Fifth Generation)

পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার বলতে বর্তমান প্রজন্মের চেয়ে আরও আধুনিকায়ন কম্পিউটার বোঝাবে।এ প্রজন্মের কম্পিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে- এগুলোর নিজস্ব বিচার বুদ্ধি থাকবে, শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে, মানুষের কণ্ঠস্বরের নির্দেশ বোঝার ক্ষমতা থাকবে। এসব কম্পিউটারের স্মৃতিতে তথ্য ধারণ ক্ষমতা খুব বেশি হবে এবং প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাও খুব বেশি হবে। অত্যাধুনিক সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কম্পিউটারসমূহ পরামর্শকের (যেমন- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনবিদ, শিক্ষক ইত্যদি) ভূমিকায় অবতীর্ন হবে।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কম্পিউটারের প্রজন্ম
   (ক) ২ টি (খ) ৩টি
   (গ) ৪ টি (ঘ) ৫ টি

২। Apple Macintosh কোন প্রজন্মের কম্পিউটার
   (ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয়
   (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কম্পিউটার কি?
২। কাজের প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি?
৩। ডিজিটাল কম্পিউটার সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪। হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার কি?
৫। অ্যাবাকাস সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৬। মার্ক-১ কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।
৭। কম্পিউটারের চতুর্থ প্রজন্মের বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কম্পিউটারের কাজ করার পদ্ধতি আলোচনা করুন।
২। কাজের প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩। আয়তন ও ক্ষমতার ভিত্তিতে কম্পিউটারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪। কম্পিউটারের বিবর্তনে ইলেক্ট্রনিক যুগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৫। কম্পিউটারের প্রজন্ম কয়টি? বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.১

১.গ ২.খ ৩.ঘ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.২

১.ক ২.গ ৩.ঘ ৪.ঘ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.৩

১.খ ২.ক ৩.ক

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.৪

১.গ ২.গ ৩.খ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.৫

১.ঘ ২.গ ৩.গ ৪.খ ৫.খ ৬.ঘ ৭.গ ৮.ঘ

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ১.৬

১.ঘ ২.ঘ